গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৯ বর্ষ ২০ সংখ্যা ২৩ - ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

শিক্ষা বিল ঃ নগ্ন সরকারি হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা

রাজ্য কমিটির প্রতিবাদ

এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ১৬ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ (প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১৬ যা বিধানসভার বিচারাধীন আছে, তা রাজ্য সরকার যদি আইনে পরিণত করে তা হলে বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় (কলেজ) সমেত উচ্চশিক্ষায় যতটুকু স্বশাসনের সুযোগ এখনও আছে তাকে তছনছ করে দেবে। উচ্চশিক্ষায় শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করার নাম করে এই বিল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার প্রায় সর্বস্তরে সরকার ও শাসক দলের নগ্ন হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা করেছে। রাজ্য সরকারের দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁরা জানেন, পূর্বতন সিপিএম সরকার কীভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার হরণ করেছিল এবং তার বিরুদ্ধে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ মনীষীদের শিক্ষা-স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রাম স্মরণ করে কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষানুরাগী মানুষ লড়েছিলেন। তাই আমরা বর্তমান সরকারের একই ধরনের পরিকল্পনা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

এই বিল আইনে পরিণত হলে সরকার শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, আধিকারিক সমেত ছাত্র ইউনিয়নের আচরণ বিধি প্রণয়ন করবে যা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক। বায়োমেট্রিক উপস্থিতি বা বাৎসরিক সম্পত্তির হিসাব প্রদান, চাকরির নতুন শর্তাবলি আরোপ করার কথা বলে সরকার এই

দুয়ের পাতায় দেখুন

প্রস্তাবিত উচ্চশিক্ষা বিলের প্রতিবাদে ১৬ ডিসেম্বর বিধানসভার গেটে এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ। গ্রেপ্তার ৫৪, আহত ১৪। বিল স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে সরকার।

মেডিক্যাল কাউন্সিল ভেঙে নতুন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন গঠন

স্বাস্থ্যের অধিকার হরণের চক্রান্ত

কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করেছে ভারতে চিকিৎসকদের শিক্ষা এবং পেশা সংক্রান্ত নিয়ামক সংস্থা, 'মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া'কে (এম সি আই) চিরতরে বাতিল করে 'ন্যাশনাল মেডিক্যাল কাউন্সিল' (এন এম সি) নামক নতুন সংস্থা গঠন করে, তার উপর সমস্ত দায়দায়িত্ব অর্পণ করবে। এ বিষয়ে বিল পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৫৬ সালের আইন বলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হওয়া মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়াকে ধ্বংস করে মূলত সরকারের পছন্দসই ব্যক্তিদের নিয়ে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কেন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন গড়ে তোলা দরকার, তার পিছনে যে সব যুক্তি সরকার উপস্থিত করছে তার মধ্যে আছে মেডিক্যাল কাউন্সিল দুর্নীতিপূর্ণ, শিক্ষার এবং চিকিৎসকদের পেশাগত দায়-দায়িত্ব

দুয়ের পাতায় দেখুন

কর্ণাটকে আশা কর্মীদের বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ

নিয়মিত সাম্মানিক বেতন, বৈষম্য দূর করা, সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা, বকেয়া বেতন মেটানো ইত্যাদি দাবিতে ১৬ ডিসেম্বর এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ইউনিয়নের ২০ হাজার আশা কর্মী বাঙ্গালোরে বিক্ষোভ দেখান। সংবাদ চারের পাতায়।

প্রধানমন্ত্রীজি, ভুল ভাঙছে আমাদের

সত্যটা ধরতে পারছি

দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমাগত বাড়ছে। গৃহস্থ সংসার চালানোর টাকা জোগাড় করতে পারছেন না, ব্যবসায়ী প্রয়োজন মতো সামগ্রী কিনতে পারছেন না, ক্ষুদ্র উৎপাদকরা কাঁচামাল কিনতে পারছেন না, শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন দিতে পারছেন না, পেনশনভোগী প্রবীণরা পেনশন তুলতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, চা-বাগানে, চটকলে শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছেন না, পরিযায়ী শ্রমিকরা অন্য রাজ্য থেকে ফিরে আসছেন নিজেদের এলাকায়। তবু মানুষ সহ্য করছিলেন কারণ, প্রথম দিকে মানুষের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকে 'যুগান্তকারী', 'আমাদের আর কী, ফল ভুগবে কালো টাকার মালিকরা' প্রভৃতি নানা রকম সমর্থন সূচক মনোভাব কাজ করছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তা কেটে যেতে থাকে। প্রথম দিকে অনেকেই মনে করেছিলেন, এর আগে কোনও সরকার যে সাহস দেখাতে পারেনি, নরেন্দ্র মোদি বাপের বেটা, তিনি তা দেখিয়েছেন। নিজেদের জীবনের দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তির কোনও দিশা দেখতে না পাওয়া মানুষ প্রধানমন্ত্রীর এই পদক্ষেপকে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরার মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন। ভেবেছিলেন, নিজেদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা কালো টাকার কারবারিরা গ্রেপ্তার হবে, শাস্তি পাবে। লক্ষ লক্ষ কোটি কালো টাকা উদ্ধার হবে, সরকারি কোষাগারে জমা পড়বে, সাধারণ মানুষের জন্য সামাজিক সুযোগ-সুবিধাগুলি সরকার এবার বাড়াবে। এমনকী জিনিসপত্রের দামও হয়ত কমবে। জীবনটা আর আগের মতো দুঃখময় থাকবে না।

এই আকাশকুসুম কল্পনা থেকেই মানুষ লাইনে দাঁড়ানোর যাবতীয় কষ্ট, সংসার চালানোর অসুবিধা, ব্যবসায়িক ক্ষতি এসব মেনে নিচ্ছিলেন। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও দু'হাজার টাকার নোট নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন, তারপর সেই নোট নিয়ে এক দোকান থেকে আর এক দোকানে চরকি পাক খাচ্ছিলেন। তারপরও তাঁরা বলছিলেন, যত দুর্ভোগ, যত কষ্টই হোক, এ তো সাময়িক, এরপর তো দুঃখের কাল কেটে গিয়ে সুখেরই সময় আসবে। বড় কিছু পাওয়ার জন্য তো এমন একটু কষ্ট সইতেই হবে।

কিন্তু জীবনটা তো শুধু কল্পনা নয়, বাস্তবও। তাই দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নগুলি যখন অধরাই থেকে গেল তখন মানুষের মোহ ভাঙতে থাকল। মানুষ বিচার করতে শুরু করল— কই কালো টাকা তো এখনও পর্যন্ত কিছুই উদ্ধার হল না! কোনও রাঘব বোয়াল তো এখনও গ্রেপ্তার হল না! চারপাশে ছড়িয়ে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্যের অধিকার হরণের চক্রান্ত

একের পাতার পর

পালন দেখভালের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, মেডিক্যাল কলেজের স্বীকৃতি প্রদান বা ক্যাপিটেশনের ভিত্তিতে ছাত্রভর্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি ও কারচুপি হচ্ছে, যে সমস্ত চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে রাজ্যে বা কেন্দ্রে চিকিৎসা সংক্রান্ত অভিযোগ জমা পড়েছে তার বিরুদ্ধে তদন্তসাপেক্ষে কার্যকরী কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার পূর্বতন প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত দুর্নীতিতে যুক্ত ছিলেন এবং সাধারণভাবে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ এলে সংস্থার অকর্মণ্যতার কারণে বেশিরভাগ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই জনসাধারণের কোনও বিশ্বাস এই নিয়ামক সংস্থা এম সি আই-এর উপর অবশিষ্ট নেই।

এ কথা সত্য নতুন 'প্রাইভেট' মেডিক্যাল কলেজকে স্বীকৃতি দানের ক্ষেত্রে বা বর্ধিত আসনের অনুমোদন দিতে দীর্ঘকাল ধরে এম সি আই-এর কর্তাব্যক্তিরা যে পরিমাণে 'কালো টাকা'র লেনদেন করেছে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভ্রাট ও বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে অভিযোগের নিষ্পত্তি করতে সে ব্যর্থ হয়েছে তা অনস্বীকার্য। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার হস্তান্তর যে এসব ক্ষেত্রে হয়েছে, তা ইতিমধ্যেই সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত এবং বহুচর্চিত। যার জন্য অতীতে নিয়ামক সংস্থার সভাপতিকে জেলেও যেতে হয়েছে। অর্ডিন্যান্স জারি করে আগের সরকার ২০১০ সালে মেডিক্যাল কাউন্সিল ভেঙে বোর্ড অফ গভর্নর্সদের দিয়ে কাউন্সিল চলিয়েছে। কিন্তু নতুন সংস্থা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন তৈরি করলেই যে সে দুর্নীতি রোধ করতে সক্ষম হবে এবং মেডিক্যাল শিক্ষা ও চিকিৎসা পেশার স্বচ্ছতা-সততা বা মর্যাদা রক্ষা করতে সফল হবে তার গ্যারান্টি কোথায়? যে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার বেঁচে থাকার স্বার্থেই প্রতি মুহূর্তে প্রতি ক্ষেত্রে দুর্নীতির জন্ম দিচ্ছে, তা বজায় থাকলে নতুন নিয়ামক সংস্থা এবং তার অধীনে তৈরি একাধিক বোর্ড যে অচিরেই দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত হবে তা এক প্রকার নিশ্চিত করেই বলা যায়। এম সি আই-কে বিলুপ্ত করতে সরকার কী কী ব্যবস্থা নিতে চলেছে?

প্রথমত, সরকারের পছন্দ মাফিক (নমিনেটেড) কিছু চিকিৎসক, শিক্ষক, আইনবিদ এবং সমাজের অন্যান্য পেশার মানুষদের নিয়ে কমিশন গঠন করা হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, সরকারের পছন্দ এবং বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে কিছু চিকিৎসক ও অ-চিকিৎসক ব্যক্তিকে নিয়ে এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন তৈরি হবে। এই জাতীয় কমিশনের অধীনে চারটি বোর্ড গঠিত হবে— (ক) স্নাতক স্তরের শিক্ষা, (খ) স্নাতকোত্তর শিক্ষা, (গ) কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি এবং মানরক্ষা, (ঘ) ডাক্তারদের পেশাগত গুণমান, সামাজিক দায়বদ্ধতা, এথিক্স ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ। কোনও ক্ষেত্রেই নির্বাচনের কোনও ব্যাপার নেই— সবই হবে সরকারি মন্ত্রী-কর্তাদের মর্জিমতো। তাই সরকারের ইচ্ছা ও অঙ্গুলি হেলনেই যে এগুলি পরিচালিত হবে তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

নীতি আয়োগের পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যের সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশকে অস্ত্র করে সরকার এম সি আই বিলোপের নীল নক্সা তৈরি করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রের স্বাধিকার (অটোনমি) যাতে পুরোপুরি ধ্বংস হয়, নিয়ামক সংস্থাগুলি পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে তারই আয়োজন করা হয়েছে। শুধু কেন্দ্রীয় স্তরেই নয়, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এমনকী স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে এ রাজ্যের সরকারও যে শিক্ষার স্বাধিকারকে পদদলিত করে গণতান্ত্রিক শিক্ষার পরিবেশ-পরিকাঠামোকে টুঁটি টিপে হত্যা করছে তা বলাই বাহুল্য। সরকার বেতন দেয়, তাই সরকারের কথা মেনে শিক্ষালয়গুলিকে চলতে হবে বলে খোদ শিক্ষামন্ত্রীই যখন হুঙ্কার দেন, তখন এ রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে কেমন গণতন্ত্র বিরাজ করছে তা বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না। তাই রাজ্যে রাজ্যে মেডিক্যাল কাউন্সিলগুলির মতো পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলও সরকারি দলের ইচ্ছা ও মর্জিমাফিক পরিচালিত হচ্ছে। চিকিৎসা সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত করে চিকিৎসাকর্তাদের শাস্তি দিতে বা রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে— যা সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণেও ফুটে উঠেছে। রাজ্যের সরকারি-বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলির পরিকাঠামো, প্রশিক্ষণ ও পরিষেবার মান অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়া সত্ত্বেও তা শোধরানোর কোনও ভূমিকা না নিয়ে, রাজ্য সরকারের তল্পিবাহকের কাজ করছে বলে জনমানসে এই সংস্থার কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। রাজ্যের কাউন্সিলের সভাপতি, যাঁর চিকিৎসকদের ত্রুটি বিচ্যুতি-অন্যায়-অবহেলা বিচার করে শাস্তি দেওয়ার কথা, তিনিই সরকারি বৃহৎ হাসপাতালে 'কুকুরের ডায়ালিসিস' করার নিদান দিচ্ছেন তার বশংবদ চিকিৎসকদের মাধ্যমে! ঠিক এই সব কারণেই জনসমক্ষে এমসিআই-ও হারিয়েছে ভুক্তভোগী মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা। আর এই 'অনাস্থাকে' মূলধন করে সরকার তার উদ্দেশ্য পূরণের হীন স্বার্থে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় যে সংস্থা তৈরি হত ১৯৫৬ সালের আইন বলে, আইন পরিবর্তন করে তাকে সরকার নিয়ন্ত্রিত অগণতান্ত্রিক সংস্থায় পরিণত করছে। যাতে শিক্ষার বেসরকারিকরণ-ব্যবসায়ীকরণ ও স্বাস্থ্যকে পুরোপুরি পণ্য করা এবং চিকিৎসকদের কর্পোরেটের দাসে পরিণত করার অভিসন্ধি পূরণ করা যায়। ইতিমধ্যেই সরকার বর্তমান এম সি আই-এর সুপারিশ নিয়ে ঘোষণা করেছে শুধু অলাভজনক ট্রাস্ট বা সোসাইটি নয়, এখন থেকে কর্পোরেট সংস্থা, ব্যক্তি মালিক, লাভজনক ট্রাস্ট বা সোসাইটি যে কেউ ইচ্ছা করলেই লাভের উদ্দেশ্য নিয়েই মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে পারবে। অর্থাৎ মেডিকেল কলেজে সিটের দাম আরও বাড়বে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল শিক্ষায় কোটি কোটি টাকার কারবার চলবে। এমনিতেই সর্বভারতীয় স্তরে অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা 'নিট' (এনইইটি) চালু করার ফলে (যা আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে আবশ্যিক) সরকারি-বেসরকারি সব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মান' এক ধাক্কায় 'সমান' করে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা যখন ব্যবসা, মেডিক্যাল শিক্ষা আরও লাভজনক ব্যবসা তখন সেখানে পুঁজির মালিকদের তীব্র প্রতিযোগিতা থাকবেই। আর থাকবে বাজারের নিয়মেই চূড়ান্ত পর্যায়ের দুর্নীতি। 'মেধার মৃত্যু এবং অধিক মূল্যের' জয়জয়কারের ফলে ভবিষ্যতে মেডিক্যাল শিক্ষা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও চিকিৎসা পেশার মানরক্ষা কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়।

এই নতুন কমিশনের তত্ত্বাবধানে বোর্ডের মাধ্যমে স্থির হবে কলেজ হাসপাতালের মান? সুরক্ষিত হবেন ডাক্তাররা? যে সমস্ত হাসপাতাল বা ডিসপেনসারিতে বসে তাঁরা চিকিৎসা করবেন সেগুলির স্ট্যান্ডার্ড রক্ষিত হবে? সরকার যেখানে ক্রমশ স্বাস্থ্য বরাদ্দ কমিয়ে, ওষুধ ছাঁটাই করে এবং ওষুধের দাম বৃদ্ধি করে 'দায়' ঝেড়ে ফেলতে চাইছে— সেখানে বেসরকারি ক্ষেত্র যে পরিষেবার পরিবর্তে বোর্ডকে 'উচিত মূল্য' ধরে দিয়ে তাদের 'মান' রক্ষা করবে তা স্বতঃসিদ্ধ। তাই নতুন কমিশনের মাধ্যমে মেডিক্যাল শিক্ষার মান রক্ষিত হবে, চিকিৎসকদের দায়বদ্ধতা বাড়বে, চিকিৎসা সুলভ ও বিশ্বাসযোগ্য হবে বলে মনে করার কোনও বাস্তবসম্মত কারণ নেই।

গণতন্ত্রের অবয়ব রক্ষার অছিলায় নতুন বিলে কমিশনের একটি জাতীয় উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠনের উল্লেখ করা হয়েছে। এই উপদেষ্টা কাউন্সিলে বিভিন্ন রাজ্যের, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের, সরকারের, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং রাজ্য কাউন্সিলগুলির প্রতিনিধিরা থাকবেন। কিন্তু তাঁদের উপদেশ 'অপশনাল'— কমিশন গ্রহণ করতেও পারে, নাও পারে। কাজেই তা মূল্যহীন।

সমাজসচেতন চিকিৎসক ও চিকিৎসক সংগঠনগুলিকে এম সি আই বিলোপের পিছনে সরকারের গূঢ় উদ্দেশ্যকে বুঝে জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে। ন্যাশনাল কমিশন দুর্নীতি বন্ধ, বা চিকিৎসা পেশা ও মেডিকেল শিক্ষার মান রক্ষা করতেই পারে না, বরং তা চিকিৎসক ও চিকিৎসা পেশাকে সম্পূর্ণরূপে কর্পোরেট পুঁজির কুক্ষিগত করে, চিকিৎসা পরিষেবাকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যাবে এবং চিকিৎসকদের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও মর্যাদা হানি করবে। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যের অধিকারের স্বার্থে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

জীবনাবসান

বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের পার্টিকর্মী কমরেড পি কে মৈত্র দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৯ নভেম্বর স্থানীয় একটি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

১৯৬৫ সালে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি আলোচনা শোনার পরই তিনি এস ইউ সি আই (সি) করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন মাত্র চার-পাঁচজন কর্মী দুর্গাপুরে সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কমরেড মৈত্র সেই সময়ে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের অত্যাচারের মধ্যেও ওই কমরেডদের সাথে নিভীকভাবে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় ট্রেডই উনিয়ন গড়া, দলের উদ্যোগে মনীষী চর্চা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন। অসুস্থতার মধ্যেও চেষ্টা করতেন সাধারণ মানুষকে দলের প্রতি আকৃষ্ট করার। সব সময়ে দলের পত্র-পত্রিকা খুঁটিয়ে পড়তেন। তাঁর সাহসিকতা এবং যে কোনও অবস্থাতেই দলের কাজ করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সকল কর্মীর কাছেই শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। কমরেড মৈত্রের মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু, রাজ্য কমিটির সদস্য জেলা সম্পাদক কমরেড রতন কর্মকার, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী।

কমরেড পি কে মৈত্র লাল সেলাম

জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার চাটুমাদার অঞ্চলের দান্দুড়ি গ্রামের এস ইউ সি আই (সি) কর্মী কমরেড অনন্ত মাহাত ২৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় তাঁর বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেশ কয়েক বছর যাবৎ তিনি ডায়াবিটিস ও হাইপারটেনশনে ভুগছিলেন এবং পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙে যাওয়ায় শেষের দিকে এক বছরেরও বেশি সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে এবং শোকাভিভূত সমস্ত কর্মী, সমর্থক, দরদি ও সাধারণ মানুষ তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

প্রথম জীবনে তিনি গান্ধীবাদী রাজনৈতিক দল লোকসেবক সঙ্ঘের কর্মী ছিলেন। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে কমরেড সুখময় মাইতির মাধ্যমে তিনি দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হন এবং তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এস ইউ সি আই (সি) দলে যোগ দেন। চাটুমাদার অঞ্চল সহ হুড়া থানার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিভিন্ন দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে কৃষক ও খেতমজুরদের এক ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সেই আন্দোলনে কমরেড অনন্ত মাহাত বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। এই আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে তাঁকে কংগ্রেস দলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের হাতে শারীরিক নির্যাতনও সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁকে টলানো যায়নি। চাটুমাদার লোকাল কমিটি গঠিত হলে তাঁকেই সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং দীর্ঘদিন তিনি এই দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করেন। একদিকে প্রতিবাদী চরিত্র, অন্যদিকে গরিব মানুষের প্রতি অগাধ ভালবাসার গুণে তিনি প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামসভায় জয়লাভ করেন এবং সেখানেও তিনি যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল পার্টিকর্মীদের অবারিত দ্বার, সানন্দে তাঁদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। তিনি ছিলেন তাঁদের সুখদুঃখের সাথী। তাঁদের আদর্শগত মান উন্নয়নের জন্যও তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন। যতদিন শারীরিকভাবে সমর্থ ছিলেন দলের সমস্ত কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। শয্যাশায়ী অবস্থাতেও দলের ও কর্মীদের খোঁজখবর নিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে দল এক সৎ নিষ্ঠাবান সংগঠককে হারাল।

কমরেড অনন্ত মাহাত লাল সেলাম

প্রস্তাবিত উচ্চশিক্ষা বিলের প্রতিবাদ

একের পাতার পর

বিলের মাধ্যমে শিক্ষক সমেত উচ্চশিক্ষার সকল কর্মী-আধিকারিকদের সামাজিক মর্যাদার উপর নগ্ন আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে। আমরা এই বিলকে শিক্ষায় গণতন্ত্রের হত্যাকারী স্বৈরতান্ত্রিক কালা বিল মনে করি। সরকার এই বিল আপাতত স্থগিত করলেও পুনরায় তা আনার চেষ্টা করতে পারে। সেক্ষেত্রে শিক্ষানুরাগী অভিভাবক শিক্ষক ছাত্রসমাজকে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি। অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক কার্ত্তিক সাহা বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বুদ্ধিজীবীরা একটি সামাজিক স্তর, যা সমস্ত শ্রেণি থেকেই সদস্য সংগ্রহ করে

বিশেষ অষ্টম কংগ্রেসে কমরেড জে ভি স্ট্যালিনের ভাষণ, ২৫ নভেম্বর, ১৯৩৬

রাশিয়ার মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপনে নিয়োজিত হয়েছি আমরা। গণদাবীর কয়েকটি সংখ্যায় নভেম্বর বিপ্লবের সংগঠনপর্বের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করা হয়েছে। এরপর সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মহতী সাফল্য ও অর্জনগুলি, যা মানবসভ্যতার ইতিহাসে যুগান্তকারী, তার কিছু কিছু দিক প্রকাশ করা হবে।

৫ ডিসেম্বর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ইতিহাসে এক বিশাল তাৎপর্যময় দিবস। ১৯৩৬ সালে এই দিনটিতেই মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট ইউনিয়নে গ্রহণ করা হয়েছিল নতুন সংবিধান, যা বিশ্বে 'স্ট্যালিন সংবিধান' নামে খ্যাত হয়েছিল। বিশ্বখ্যাত মানবতাবাদী মনীষীরা ওই সংবিধানকে দু'হাত তুলে অভিনন্দন জানিয়ে আবাহন করেছিলেন।

এই সংবিধানের খসড়া সম্পর্কে মহান স্ট্যালিন যে ভাষণ দেন তা আমরা প্রকাশ করছি। আকারে বড় হওয়ায় পাঠকদের সুবিধার জন্যই কয়েকটি ভাগে এটি প্রকাশ করা হচ্ছে। এবার চতুর্থ কিস্তি।

৫. খসড়া সংবিধানের সংশোধন ও সংযোজন

দেশব্যাপী খসড়া নিয়ে আলোচনার সময় নাগরিকেরা যে সমস্ত সংশোধন সংযোজনের প্রস্তাব রেখেছেন সে বিষয়ে এবার যাওয়া যাক। আপনারা জানেন, খসড়া সংবিধান নিয়ে দেশব্যাপী আলোচনার সময় অসংখ্য সংশোধনী ও সংযোজনী এসেছে। সোভিয়েত সংবাদপত্রে তার সমস্তই প্রকাশিত হয়েছে। এই সব সংশোধনী বৈচিত্র্যে বিশাল এবং তাদের মূল্যও এক নয়। আমার মতে, এই সব সংশোধনীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম ধরনের সংশোধনীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, তারা শুধু সাংবিধানিক প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা করেনি, আলোচনা করেছে ভবিষ্যৎ আইনি প্রতিষ্ঠানের বর্তমান আইনি কাজকর্ম নিয়ে। কিছু প্রশ্ন হল বিমা সংক্রান্ত, কিছু প্রশ্ন যৌথ খামারের বিকাশ সংক্রান্ত, কিছু প্রশ্ন আবার শিল্প বিকাশ সংক্রান্ত, কিছু বা আবার আর্থিক প্রশ্ন নিয়ে। সংশোধনী এই সব বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছে। পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে, এই সব সংশোধনীর রচয়িতারা জানেন না সাংবিধানিক প্রশ্ন ও চলতি আইনি প্রশ্নের মধ্যে পার্থক্য কী। তাই তাঁরা চেষ্টা করেছেন যত বেশি সম্ভব আইনকে সংবিধানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে। এইভাবে তারা সংবিধানকে আইনি নীতিমালায় পরিণত করার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সংবিধান আইনি নীতি মালা নয়। সংবিধান হল মৌলিক আইন এবং একমাত্র মৌলিক আইনই। ভবিষ্যতের আইনি সংস্থাগুলো চলতি আইনি কাজগুলো কীভাবে করবে সংবিধান সেই প্রশ্ন বাতিল করে না, বরং তাকে আগে থেকেই দেখতে পায়। এই সব সংগঠনের ভবিষ্যতের আইনি কাজ কর্মের কানুনি ভিত্তি দেয় সংবিধান। তাই, এই ধরনের সংযোজনী-সংশোধনীর সাথে সংবিধানের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই। তাই, তাদের মতে, এই সব সংযোজনী-সংশোধনীকে দেশের ভবিষ্যৎ কানুনি সংগঠনগুলোর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয় ধরনের সংশোধনী-সংযোজনী সংবিধানের মধ্যে নানা ঐতিহাসিক তথ্য ঢোকানোর চেষ্টা করেছে, বা চেষ্টা করেছে সেই সব ঘোষণার অংশবিশেষ ঢোকাতে যা সোভিয়েত সরকার এখনও অর্জন করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতে তা তাকে অর্জন করতে হবে। সংবিধানে পার্টির অসুবিধার কথা বর্ণনা করা, শ্রমিক শ্রেণির অসুবিধার কথা বর্ণনা করা এবং সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্য সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে সুদীর্ঘ বছর ধরে যে সব অসুবিধা অতিক্রম করতে হয়েছে তা বর্ণনা করা, সোভিয়েত আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ সংবিধানে পূর্ণাঙ্গ সাম্যবাদী সমাজ গঠনের ইঙ্গিত দেওয়া— এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিভিন্নভাবে এই সব সংশোধনী আলোচনা করেছে। আমি মনে করি, এই সব সংশোধনী ও সংযোজনীকে পাশে সরিয়ে রাখা উচিত। কারণ এই সব সংশোধনী ও সংযোজনীর সাথে সংবিধানের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই। যে সব সাফল্য আমরা অর্জন করেছি ও নিশ্চিত করেছি সংবিধান হল তার আইনি স্বীকৃতি ও মূর্তপ্রকাশ। সংবিধানের এই মৌলিক চরিত্র যদি আমরা বিকৃত করতে না চাই তাহলে সংবিধানকে অতীতের ঐতিহাসিক তথ্যে ভারাক্রান্ত করা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে বা সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমজীবী মানুষ ভবিষ্যতে কী

সাফল্য অর্জন করবে তার ঘোষণা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। এ জন্য আমাদের ভিন্ন উপায় ও অন্য নথি আছে। সবশেষে, তৃতীয় আর এক ধরনের সংশোধনী-সংযোজনী আছে যাদের খসড়া সংবিধানের সাথে সরাসরি সম্পর্ক আছে। এই ধরনের সংশোধনীর মধ্যে একটা বিরাট সংখ্যা হল শুধু শব্দের হেরফের। এই সব সংশোধনীকে বর্তমান কংগ্রেসের ড্রাফটিং কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। আমার মনে হয় বর্তমান কংগ্রেস এই ড্রাফটিং কমিশন গঠন করবে। একে নতুন সংবিধানের চূড়ান্ত বয়ান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হবে।

তৃতীয় ধরনের বাদবাকি সংশোধনী সম্পর্কে বলা যায়, তাদের বৃহত্তর বাস্তব তাৎপর্য আছে। এবং আমার মতে তাদের সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলা প্রয়োজন।

১. খসড়া সংবিধানের ১নং ধারা সম্পর্কে যে সব সংশোধনী দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে চারটি সংশোধনী দেওয়া হয়েছে।

কেউ কেউ প্রস্তাব দিয়েছেন "শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রের" পরিবর্তে আমাদের বলা উচিত "শ্রমজীবী মানুষের" রাষ্ট্র। আবার কেউ কেউ প্রস্তাব দিয়েছেন "শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রের সাথে যোগ করা উচিত" "এবং শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবী" শব্দগুলো। তৃতীয় আর এক গ্রুপ প্রস্তাব দিয়েছে "শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রের" পরিবর্তে আমাদের লেখা উচিত "সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাসকারী সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তার রাষ্ট্র"। চতুর্থ আর একটা গ্রুপ প্রস্তাব দিয়েছে "কৃষক" কথাটার বদলে আমাদের লেখা উচিত "যৌথখামারী" বা "সমাজতান্ত্রিক কৃষির শ্রমজীবী মানুষ"।

এই সব সংশোধনীকে কি গ্রহণ করা উচিত? আমি মনে করি গ্রহণ করা উচিত নয়।

খসড়া সংবিধানের ১নং ধারা কী নিয়ে আলোচনা করছে? করছে সোভিয়েত সমাজের শ্রেণিগত গঠন নিয়ে। আমরা মার্কসবাদীরা কি আমাদের সমাজের শ্রেণিগত গঠনের প্রশ্নকে সংবিধানে উপেক্ষা করতে পারি?

না, পারি না। আমরা যেহেতু জানি, সোভিয়েত সমাজ শ্রমিক ও কৃষক— এই দুই শ্রেণি নিয়ে গঠিত এবং এই বিষয়েই খসড়া সংবিধানের ১নং ধারা আলোচনা করছে। তাই, খসড়া সংবিধানের ১নং ধারা যথাযথভাবে আমাদের সমাজের শ্রেণিগত গঠন নিয়ে আলোচনা করছে। বলা যেতে পারে— শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে কি বলা হবে? বুদ্ধিজীবীরা কখনওই একটা শ্রেণি নয়, কখনওই একটা শ্রেণি হতে পারে না— এটা একটা স্তর এবং একটা স্তরই থাকবে। এই স্তর সমাজের সমস্ত শ্রেণি থেকেই সদস্য সংগ্রহ করে। আগেকার দিনে বুদ্ধিজীবীরা অভিজাত সম্প্রদায় থেকে সদস্য সংগ্রহ করত। সদস্য সংগ্রহ করত বুর্জোয়াদের আর অংশত কৃষকদের মধ্য থেকে। আর শ্রমিকদের মধ্য থেকেও সদস্য সংগ্রহ করত, তবে তা খুবই কম। আমাদের এই সময়ে, সোভিয়েত রাজত্বে, বুদ্ধিজীবীরা মূলত শ্রমিক-কৃষকদের মধ্য থেকেই সদস্য সংগ্রহ করে। কিন্তু যাদের মধ্য থেকেই সদস্য সংগ্রহ করা হোক আর তাদের চরিত্র যাই হোক, বুদ্ধিজীবীরা একটা শ্রেণি নয়। তারা একটা সামাজিক স্তর ছাড়া কিছু হতে পারে না।

এই পরিস্থিতি কি শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীদের অধিকার হরণ করে? না, একটুও করে না! খসড়া সংবিধানের ১নং ধারা সোভিয়েত সমাজের বিভিন্ন স্তরের অধিকার নিয়ে আলোচনা করে না। আলোচনা করে সোভিয়েত সমাজের শ্রেণি গঠন নিয়ে। শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীদের অধিকার সহ সোভিয়েত সমাজের বিভিন্ন স্তরের অধিকার নিয়ে আলোচনা হয়েছে খসড়া সংবিধানের মূলত ১০ ও ১১ নং অধ্যায়ে।

এই সমস্ত অধ্যায়ে পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে, শ্রমিক-কৃষক-শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীরা দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত ক্ষেত্রেই পুরোপুরি একই অধিকার ভোগ করে।

তাই, শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীদের অধিকার হরণের কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সব জাতি ও জাতিসত্তা নিয়ে তৈরি হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। খসড়া সংবিধানের দুই নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমঅধিকার সম্পন্ন জাতিগুলির স্বাধীন মিলনক্ষেত্র। খসড়া সংবিধানের ১নং ধারায় কি এটা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে? পরিষ্কার বোঝা যায়, প্রয়োজন নেই। কারণ ১নং ধারা সোভিয়েত সমাজের জাতিগত গঠন নিয়ে আলোচনা করছে না, আলোচনা করছে তার শ্রেণিগত গঠন নিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সব জাতি ও জাতিসত্তা নিয়ে গঠিত, খসড়া সংবিধানে তাদের অধিকার নিয়ে আলোচনা হয়েছে ২, ১০ এবং ১১ নং অধ্যায়ে। এই সব অধ্যায়ে পরিষ্কার বলা আছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একই অধিকার ভোগ করে।

তাই, জাতির অধিকার হরণের কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

'কৃষক' শব্দটিকে 'যৌথ খামারী' বা 'সমাজতান্ত্রিক কৃষির শ্রমজীবী' — এই কথার দ্বারা প্রতিস্থাপিত করাও ভুল হবে। প্রথমত, যৌথখামারীদের পাশাপাশি এখনও কৃষকদের মধ্যে দশ লক্ষের বেশি

ছয়ের পাতায় দেখুন

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের নদীয়া জেলা সম্মেলন

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের নদীয়া জেলার দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আম্বেদকর ভবনে ৪ ডিসেম্বর। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৯০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন সংগঠনের রানাঘাট কমিটির সম্পাদক শীতল দে। সমর্থনে বলেন জেলা কমিটির সদস্য অঞ্জন মুখার্জী, ডাঃ অশোককুমার সাহা, ডাঃ সত্যেন মজুমদার, ডাঃ নিলাদ্রীশেখর পাল, শিক্ষক জয়দেব মুখার্জী, শিক্ষক সদানন্দ কর্মকার। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির পক্ষে ডাঃ অংশুমান মিত্র এবং ডাঃ সত্যজিৎ রায়। প্রধান বক্তা ডাঃ সজল বিশ্বাস স্বাস্থ্যকে বিমা নির্ভর করে তোলার বিরোধিতা করেন।

ডাঃ সত্যজিৎ রায়কে সম্পাদক ও ডাঃ অপূর্ব রায়কে সভাপতি করে ১৫ জনের নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়।

বাঁকুড়ায় সরকারি কর্মচারীদের বিক্ষোভ

৬ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারি চালক ও কারিগরি কর্মচারী সমিতি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল এএনএম (আর) এমপ্লয়িজ সোসাইটি বাঁকুড়া শহরে যৌথভাবে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করে। অবিলম্বে পে-কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ ও ১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে কার্যকর করা, সমস্ত অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ সহ আট দফা দাবিতে ওই দিন জেলাশাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়। ডেপুটেশনে অংশ নেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারি চালক ও কারিগরি কর্মচারী সমিতির বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক মানিক মণ্ডল ও ওয়েস্ট বেঙ্গল এএনএম (আর) এমপ্লয়িজ সোসাইটি র জেলা সম্পাদিকা শিখা নন্দী। কর্মচারীদের সামনে বর্তমান পরিস্থিতি ও কর্মচারী আন্দোলন প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সত্যেন মজুমদার।

ওয়াটার ক্যারিয়ার, সুইপার, নাইট গার্ড কাম কেয়ার টেকার, রাঁধুনি প্রভৃতি কর্মচারীদের বেতন ২-৩ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা করা, সমস্ত কর্মীর স্থায়ীকরণ সহ বিভিন্ন দাবি বক্তারা তুলে ধরেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারীদের ৫৭ শতাংশ ডি এ কম দেওয়ার প্রতিবাদ জানান তাঁরা।

হাবড়া বিডিওতে কৃষক বিক্ষোভ

এ আই কে কে এম এস-এর উত্তর ২৪ পরগণা ১ নং ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ৬ ডিসেম্বর হাবড়া বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। দাবি ছিল খাস জমিতে বসবাসকারী আদিবাসী সহ সকলকে পাট্টা দেওয়া, পৃথিবা অঞ্চলে ময়নাতলা-তালতলার রাস্তা সারাই, রেশন কার্ড, ১০০ দিনের কাজ দেওয়া, সরকারি ভাবে চাষির কাছ থেকে সরাসরি ধান কেনা ইত্যাদি। এদিন দুই শতাধিক মানুষ বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হন। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড কানাই ঘোষ।

মহিষাদলে গণদাবীর পাঠকদের মতবিনিময় সভা

৩০ অক্টোবর পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলে 'অগ্নিবীণা' ভবনে দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গণদাবী'র পাঠকদের নিয়ে একটি মতবিনিময় সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দিলীপ মাইতি, কমরেড জীবন দাস, জেলা কমিটির সদস্যা কমরেড লেখা রায় ও লোকাল সম্পাদক কমরেড তপন মাইতি। সভায় বহু পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত হয়ে পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য মূল্যবান মতামত পেশ করেন।

এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী ও প্রাক্তন শিক্ষক জীতেন্দ্রনাথ মাইতি বলেন, পত্রিকার গুণগতমান ভাল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোর কাজকর্মের সমালোচনা মূলক আলোচনা থাকলে আরও ভাল হয়।

শিক্ষক শিবাজীকুমার বেরা বলেন, পত্রিকাটিতে প্রতিষ্ঠান বিরোধী বক্তব্য বেশি পরিবেশিত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা হলে বেশ ভাল হয়।

বাদলচন্দ্র দুরা বহুদিনের পুরনো পাঠক। এলাকার সাংস্কৃতিক কাজকর্মে যুক্ত থাকেন। তিনি বলেন— এটি একটি অথেনটিক পেপার। কোনও কিছু বাড়িয়ে বলা হয় না। অন্যান্য পত্রিকাগুলোর থেকে গুণগত মান অনেক বেশি।

গোঁয়োখালি বাজারের অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব দুলালচন্দ্র রানা বলেন, পত্রিকাটিতে আন্তর্জাতিক সংবাদেই পাতা ভর্তি থাকে। দেশের খবর বেশি করে চাই।

গৃহশিক্ষক বিজয়কুমার বাগ বলেন, পত্রিকাটিতে কোনও সম্পাদকীয় কলম নেই, তা থাকা দরকার। পাঠকের মতামতের একটি কলম থাকা দরকার। আন্তর্জাতিক খবরগুলো বেশি কঠিন লাগে। সেগুলি আরও সহজবোধ্য করতে হবে। মনীষীদের বিষয়ে লেখাগুলো প্রাঞ্জল ও রসগ্রাহী হওয়া দরকার।

উদয় দাস এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। তিনি পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বাড়ানো ও কর্মী সংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাব দেন।

উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সন্তুকুমার বেরা বলেন, পত্রিকাটি দৈনিক হলে ভাল হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়িয়ে দাম একটু বাড়ালে ক্ষতি নেই। বিশেষ একটি পৃষ্ঠা থাকলে ভাল হয়। তাতে বিজ্ঞানের খবরাখবর থাকবে।

বর্ধমান জেলায় বিড়ি শ্রমিকদের বিক্ষোভ

মোদি সরকারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের ফলে মালিকরা বিড়ি বাঁধার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে, নগদ নেই বলে মজুরির টাকা বাকি রাখছে, সরকার-নির্ধারিত মজুরিও দিচ্ছে না। মালিকরা খারাপ পাতা সরবরাহ করছে, আবার তার জন্য বিড়ির সংখ্যা কম হলে মজুরি কেটে নিচ্ছে। এর প্রতিবাদে বিড়ি শ্রমিকরা এআইইউটিইউসি অনুমোদিত বর্ধমান জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে ১৪ ডিসেম্বর কালনা মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা দাবি করেন জেলাতেই শ্রমিক কল্যাণ দপ্তর খুলতে হবে, শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল চালু করতে হবে, বার্ধক্য ভাতা-বিধবা ভাতা-পিএফ-২ টাকা কেজি চালের ব্যবস্থা করতে হবে। সংগঠনের জেলা সম্পাদক নির্মল মাঝি, সভাপতি সুচেতা কুণ্ডুর নেতৃত্বে ৮ সদস্যের প্রতিনিধি দল এসডিও-র সঙ্গে দাবিপত্র নিয়ে আলোচনা করে।

চিটফান্ড প্রতারিতদের বিক্ষোভ কৃষ্ণনগরে

সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কার্যকরী করে দ্রুত সমস্ত চিটফান্ড আমানতকারীদের টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করা, সমস্ত এজেন্টদের সুরক্ষার ব্যবস্থা, যে সমস্ত আমানতকারী ও এজেন্ট আত্মহত্যা করেছেন ও খুন হয়েছেন তাঁদের পরিবারকে ২০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ, চিটফান্ড কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ৭ ডিসেম্বর নদিয়ার জেলাশাসক ও এস পি-র দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন অল বেঙ্গল চিটফান্ড ডিপোজিটার্স অ্যান্ড এজেন্টস ফোরামের সহ সম্পাদক আসরাফুল হক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কর্ণাটকে ২০ হাজার আশাকর্মীর বিশাল সমাবেশ

প্রায় ২০ হাজার আশা কর্মী বাঙ্গালোরে বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হলেন ১৬ ডিসেম্বর। এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত আশা কর্মী ইউনিয়ন আহূত এই সমাবেশের দাবি ছিল, নিয়মিত সাম্মানিক বেতন, বৈষম্য দূর করা, সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা, বকেয়া বেতন মেটানো ইত্যাদি। বাঙ্গালোর স্টেশন থেকে শুরু হয়ে মিছিল পৌঁছায় ফ্রিডম পার্কের বিক্ষোভ সভায়। প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল অধ্যাপক রবিবর্মা কুমার, এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সহসভাপতি কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ, আশাকর্মী ইউনিয়নের কর্ণাটক রাজ্য সভাপতি কে সোমশেখর, সম্পাদক ডি নাগলক্ষ্মী, এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কে উমা এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। কর্ণাটক সরকারের প্রতিনিধি উমেশ জি যাদব সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে দাবিগুলি বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেন।

বিহারে ভূমিহীনদের উপর পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদ

ভাগলপুরে ভূমিহীনদের জমির দাবিতে আন্দোলনরত নারী-পুরুষদের উপর নৃশংস লাঠিচার্জের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে ১২ ডিসেম্বর পাটনায় এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিলকারীরা দাবি তোলেন— 'ভাগলপুরে বর্বর লাঠিচার্জ হল কেন, নীতীশ কুমার জবাব দাও', 'ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি চাই,' 'আহতদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে', 'গরিব মানুষের আন্দোলন দমন করা বন্ধ কর।' বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মণিকান্ত পাঠক, পাটনা জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস সূর্যকর জিতেন্দ্র ও রাজকুমার চৌধুরী।

অন্ধ্রপ্রদেশে শিক্ষা কনভেনশন

তিরুপতি শহরে এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে ১ নভেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশ-তেলেঙ্গানা শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আয়োজিত এই কনভেনশনে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বি এস অমরনাথ। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি কমরেড ভি এন রাজশেখর এবং অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদক কমরেড এস গোবিন্দ রাজালু। সভাপতিত্ব করেন কমরেড ডি রাঘবেন্দ্র।

বক্তারা বলেন, অত্যধিক ব্যয় বহন করতে না পেরে বিরাট অংশের মানুষ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষা ধনীদের কুক্ষিগত হচ্ছে। পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ায় ছাত্ররা প্রায় কিছু না শিখেই প্রমোশন পেয়ে যাচ্ছে। সিলেবাসে সাম্প্রদায়িক আর এস এস এসের মতাদর্শ ঢোকানো হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষপদে নিয়োগ করা হচ্ছে আর এস এস ঘনিষ্ঠদের। বাড়ছে অন্ধচিন্তা, মরছে যুক্তিবাদী মানসিকতা। বক্তারা এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

কনভেনশন থেকে সংগঠনের অন্ধ্রপ্রদেশ-তেলেঙ্গানা রাজ্য কমিটি পুনর্গঠিত হয়। কমরেড আর গঙ্গাধর সম্পাদক এবং কমরেড রাঘবেন্দ্র সভাপতি হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

কেরালার সিপিএম সরকার ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা করল

ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যার অভিযোগ উঠল কেরালার সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে। এস ইউ সি আই (সি) কেরালা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সি কে লুকোস ২৬ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, নীলাম্বরে যে দুই ব্যক্তিকে পুলিশ 'মাওবাদী' অভিযোগে হত্যা করেছে তা রাজ্য সরকারের ভুয়ো সংঘর্ষ ছাড়া কিছু নয়।

তিনি বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ একটি পিস্তল ছাড়া আর কিছু পায়নি। ঘটনাস্থলে কোনও সাংবাদিককেও যেতে দেওয়া হয়নি। এই ঘটনা প্রমাণ করছে সিপিএম যে ভুয়ো সংঘর্ষের বিরুদ্ধে কথা বলে তা কত অন্তঃসারশূন্য। তিনি বলেন, এই ন্যক্কারজনক ঘটনার বিরুদ্ধে সরকারের শরিক সিপিআইও প্রতিবাদে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে। এই সরকারি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান।

নভেম্বর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সভা

মহান নভেম্বর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ১৪ ডিসেম্বর সল্ট লেকের ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন 'শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনে নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনাসভার আয়োজন করে হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে। মুখ্য আলোচক ছিলেন এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর সাহা। ইউনিয়নের সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র বক্তব্য রাখেন। দেড় শতাধিক হাসপাতাল কর্মী, নার্স ও চিকিৎসক সভায় অংশগ্রহণ করেন।

মধ্যপ্রদেশের কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

২০-২৩ নভেম্বর ঘাটশিলায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা শিক্ষা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল দলের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিটির রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির। ১১টি জেলা থেকে ১৭৪ জন নেতা-কর্মী শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। আদর্শগত মানোন্নয়ন এবং রাজনৈতিক কর্মধারা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এই শিবিরে পাঠ্য এবং আলোচ্য বিষয় হিসাবে মনোনীত হয়েছিল মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের 'মার্কসবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কয়েকটি দিক' পুস্তকটি। দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী শিবির পরিচালনা করেন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল।

'নির্ভয়া' দিবসে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ধিক্কার

গুয়াহাটিতে সভা ঃ জনগণের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ পুঁজিপতি শ্রেণির সরকারগুলি শ্রেণিস্বার্থেই মদ-ড্রাগসের অবাধ প্রচলন এবং অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতার জোয়ার সৃষ্টি করে ছাত্র-যুবকদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে। দেশব্যাপী উন্নত নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তুলেই নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য

সরকারকে বাধ্য করা সম্ভব। ১৬ ডিসেম্বর গুয়াহাটিতে নির্ভয়া দিবসে ছাত্র-যুব-মহিলা সমাবেশে এ কথা বলেন এস ইউ সি আই (সি) আসাম রাজ্য সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস। এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই এম এস এস-এর উদ্যোগে এই দিনটি নারী নির্যাতন বিরোধী দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

এদিন দুপুরে প্ল্যাকার্ড, ব্যানারে সুসজ্জিত দুই শতাধিক ছাত্র-যুব-মহিলার এক প্রতিবাদী মিছিল দীঘলীপুখুরী পার থেকে গুয়াহাটির বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এম এস এস-এর রাজ্য সভানেত্রী কমরেড ইনা হুসেন, ডি ওয়াই ও-র রাজ্য সভাপতি কমরেড ওসমান গণি মোল্লা এবং ডি এস ও-র রাজ্য সভাপতি কমরেড জিতেন্দ্র চলিহাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলীর পরিচালনায় আয়োজিত প্রতিবাদী সভায় তিনটি সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক যথাক্রমে কমরেডস বর্ণালী শর্মা, তুষার পুরকায়স্থ ও প্রোজ্জ্বল দেব বক্তব্য রাখেন। তাঁরা ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং ছাত্রী তথা মহিলাদের উপর নেমে আসা সমস্ত ধরণের আক্রমণ বন্ধ করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। দিল্লিতে প্যারামেডিকেলের ছাত্রী নির্ভয়াকে বীভৎস গণধর্ষণ করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া অপরাধীদের কঠোরতম শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে যে শিথিলতা দেখানো হচ্ছে বক্তারা তার তীব্র নিন্দা করেন।

বিতর্কপ্রতিযোগিতা এলাহাবাদে ঃ ১৬ ডিসেম্বর 'নির্ভয়া' স্মারক বিতর্কপ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। আয়োজক অল ইন্ডিয়া ডি এস ও। ৫০ জনের বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অমিতা পাণ্ডে, চিকিৎসক শ্বেতা সিং, সমাজকর্মী নিধি ভাদৌরিয়া এবং সাহিত্যিক নীলম শংকর। তাঁরা বিজেতাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

কলকাতায় সভা ঃ ১৬ ডিসেম্বর নারী নিগ্রহবিরোধী নাগরিক কমিটির উদ্যোগে কলকাতার হাজরা মোড়ে প্রতিবাদ সভায় নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আলোচনা, গান, আবৃত্তি ও পথনাটিকা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি ডঃ পবিত্র গুপ্ত, অধ্যাপক অনিল ঘোষ, অধ্যাপক সুদীপ্ত দাশগুপ্ত, ক্রীড়াবিদ অনিতা রায় প্রমুখ।

উপযুক্ত প্রস্তুতি ছাড়াই নোট বাতিলে জনসাধারণের ব্যাপক হয়রানির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চলছে। কলকাতার ঢাকুরিয়ায় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সামনে সই সংগ্রহ করছেন কর্মীরা, ১৪ ডিসেম্বর।

ভুল ভেঙেছে আমাদের

একের পাতার পর

থাকা 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হওয়া মানুষগুলির একজনও তো ধরা পড়ল না! প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, তাঁর এই সিদ্ধান্তে গরিবরা নিশ্চিন্তে ঘুমোবে, কালো টাকার কারবারিদের ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হবে। মানুষ দেখল, কালো টাকার কারবারিরা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, ঘুম ছুটে গিয়েছে সাধারণ মানুষেরই। লাইনে দাঁড়িয়ে, দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে আশঙ্কায় প্রাণ গিয়েছে শতাধিক মানুষের।

জিনিসপত্রের দাম কমার বদলে চাল আটা তেল নিত্যপ্রয়োজনীয় সব কিছুর দাম লাফ দিয়ে বাড়ছে। প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসবাণী আর ভোলাতে পারছে না মানুষকে। আর এটা লক্ষ করেই প্রধানমন্ত্রী আবার আসরে নামলেন, বললেন, এই শেষবার লাইনে দাঁড়ানোর কষ্ট করুন। ৬০ বছর ধরে মানুষ চিনির জন্য লাইন দিয়েছে, চালের জন্য লাইন দিয়েছে, খাবারের জন্য লাইন দিয়েছে। এবারে ব্যাংক বা এটিএমের সামনের লাইন হল ভারত থেকে সমস্ত রকম লাইন শেষ করার লক্ষ্যে শেষবারের লাইন। প্রধানমন্ত্রী বললেন, আমাকে ৫০টা দিন সময় দিন, দেখবেন এ সংকট কেটে গেছে।

কিন্তু এবারও সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার সাথে মিলল না। বিদেশের ব্যাঙ্কে জমা করা বিপুল পরিমাণ কালো টাকা উদ্ধারের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী বললেন, কালো টাকার মালিকদের নাম প্রকাশ করা যাবে না। তা হলে নাকি সেই সব দেশ থেকে আর কোনও নতুন তথ্য পাওয়া যাবেনা। বিরক্ত মানুষ প্রশ্ন তুলতে থাকল, প্রধানমন্ত্রীজি, গত সত্তর বছর ধরে তো কালো টাকার অনেক তথ্য পাওয়া গেল, কাজের কাজ কী হল? কালো টাকার মালিকদের আপনি টাকা সাদা করার সুযোগ বারে বারে দিচ্ছেন কেন? কেন তাদের গ্রেপ্তার করে কালো টাকা উদ্ধার করছেন না?

এ সব প্রশ্নের উত্তর প্রধানমন্ত্রীর কাছে নেই। তাই দেশজোড়া প্রবল ডামাডোলের মাঝে কালো টাকা উদ্ধারের প্রশ্ন এড়িয়ে তিনি ক্যাশলেস ভারত গড়ার কথা বলতে শুরু করেছেন। বলছেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কথা, নেট ব্যাংকিং, নগদবিহীন লেনদেন, ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড, মোবাইলকে ব্যাংক বানানোর কথা। অদ্ভুত ব্যাপার, তাঁর সুরে সুর মিলিয়েছেন মাইক্রোসফটের মালিক মার্কিন ধনকুবের বিল গেটস থেকে শুরু করে এ দেশের ধনকুবের টাটা, বিড়লা, আম্বানি, আদানি প্রমুখ বৃহৎ পুঁজিপতিরা সকলে। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ প্রশ্ন তুলছেন, উভয়ের সুরে এই মিলটার কারণকী? তবে কি প্রধানমন্ত্রীর ক্যাশলেস অর্থনীতির উদ্দেশ্য এই সব ধনকুবেরদের ব্যবসা বাড়ানো? কারণ, টাটাদের ডোকোমো, আম্বানিদের রিলায়েন্স, জিও, মিত্তালদের এয়ারটেল, ব্রিটেনের ভোডাফোন সকলেরই তো ইন্টারনেটের ব্যবসা। বিল গেটসের কোম্পানি মাইক্রোসফটের কম্পিউটার আর মোবাইলের ব্যবসা। নগদবিহীন লেনদেনের জন্য দরকার এইসব কম্পিউটার, স্মার্টফোন আর ইন্টারনেট সংযোগ। এ সবের বিপুল পরিমাণ খরচ সাধারণ মানুষকে বইতে হবে। ফলে যত নগদবিহীন লেনদেন বাড়বে তত এদের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠবে। মোদিজি, তা হলে সুবিধা কার হল—সাধারণ মানুষের নাকি এই সব ধনকুবেরদের?

মানুষ প্রশ্ন তুলছে, প্রধানমন্ত্রীজি, আপনি ভারতকে ডিজিটাল বানাতে চান। সেই ভারত কাদের ভারত? টাটা বিড়লা গোয়েঙ্কা আম্বানি আদানি আর পে-টিএম বিগবাজারের মালিকদের, নাকি সাধারণ মানুষের? এ হেন স্বপ্নের ভারতে দেশের একশো কোটি গরিব-নিম্নবিত্ত-সাধারণ মানুষের জায়গা হবে তো? দেশের অধিকাংশ মানুষ আজও স্বল্পশিক্ষিত না হয় নিরক্ষর। বিস্তীর্ণ গ্রাম-ভারতে কোনও মোবাইল সংযোগ নেই, ব্যাঙ্ক বহু দূরে, তা হলে এই বিরাট সংখ্যক মানুষ কি আপনার স্বপ্নের ভারতের বাইরে? যদি তাদেরও জায়গা করে দিতে হয়, তবে তার আগে তো বেশ কিছু কাজ রয়েছে যা আপনাকে করতে হবে। আপনি অবশ্য আড়াই বছর আগে ক্ষমতায় বসার জন্য সেই কাজগুলি সবই করার দেদার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বাস্তবে প্রতিশ্রুতিই থেকে গেছে সেগুলি। বেকারদের কাজের ব্যবস্থা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, মেক ইন ইন্ডিয়া, স্বচ্ছ ভারত— সবই কথার জঞ্জালে পরিণত হয়েছে। ক্ষমতায় বসার আগে ঠিক যেভাবে আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলে একশো দিনের মধ্যে বিদেশ থেকে সমস্ত কালো টাকা উদ্ধার করে আনবেন এবং প্রতিটি ভারতবাসীর ব্যাংক অ্যাকউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে ভরে দেবেন। অবশ্য আপনার দলের সভাপতি অমিত শাহই খোলাখুলি বলে দিয়েছেন, এসবই কেবল 'জুমলা' মাত্র অর্থাৎ কথার কথা।

দেশের অর্থনীতির বিরাট একটা অংশ খুচরো ব্যবসা নির্ভর। প্রধানমন্ত্রীজি, আপনার নগদ টাকা বাতিলের জেরে মধ্যবিত্তের একটা ভাল অংশের মানুষ পাড়ার দোকানে নগদে কেনাকাটা করতে না পেরে রিলায়েন্স ফ্রেশ, মোর, বিগবাজার প্রভৃতি বৃহৎ পুঁজির দ্বারস্থ হচ্ছেন কার্ডে কেনাকাটার জন্য। এদের ব্যবসা লাফ দিয়ে বাড়ছে। অনলাইন গ্রসারি সংস্থা বিগবাস্কেট-এর অন্যতম মালিক বিপুল পারেখ বলেছেন, নোট বাতিলের ফলে আমাদের বিক্রি ৪০ শতাংশ বেড়ে গেছে। আর এক অনলাইন গ্রসারি সংস্থা গ্রোফারমের এক কর্তা বলেছেন, আমাদের বিক্রি ৩০-৩৫ শতাংশ বেড়েছে এবং এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে ক্রেতারা আমাদের কাছ থেকেই কেনাকাটা করতে পছন্দ করবেন। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা স্বাভাবিক ভাবেই বৃহৎ পুঁজির সাথে এই প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে ব্যবসা গোটাতে বাধ্য হবে। প্রধানমন্ত্রীজি, আপনার নোট বাতিলের এটাই কি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল? মোদিজি, আপনি বলেছেন, দেশের একশো কোটি মানুষের হাতে নাকি এখন মোবাইল ফোন রয়েছে। ২০১১ সালের জনসমীক্ষার রিপোর্ট আপনার সরকারের আমলেই প্রকাশিত হয়েছে। অনুগ্রহ করে তাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিন। দেখবেন কিছু জনের হাতে হয়ত তিন-চারটি ফোন আছে। আর বাকি বেশিরভাগ মানুষের ফোন দূরের কথা পরার মতো ন্যাতাকানি, খাবার জন্য খুদকুঁড়ো আর মাথায় ফুটো চালের ব্যবস্থাটুকুও নেই। সাফল্য প্রমাণের নেশায় আপনি এমনও বলেছেন, দেশের ভিখারিরাও নাকি স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে! মোদিজি, নোট বাতিলের কর্মসূচির ব্যর্থতা ঢাকতে আজ অসহায় মানুষের দারিদ্রকে এমন নিষ্ঠুর পরিহাস করতেও আপনার বাধছে না।

মোদিজি, আপনার ঘোষিত ৫০ দিন পার হতে আর কয়েক দিন বাকি, অথচ আমরা দেশের সাধারণ মানুষ লাইনেই দাঁড়িয়ে আছি। আর আপনার প্রিয় বন্ধু টাটা আম্বানি আদানি আর পেটিএম বিগ বাজার স্পেনসার্স-এর মালিকদের ব্যবসা বেড়েই চলেছে। মোদিজি, আপনি বলেছিলেন, ৬০ বছরে কংগ্রেস যা করতে পারেনি আমি সেটাই করে দেখাব, ভারতকে এক দুর্নীতিমুক্ত দেশে পরিণত করব। আপনি বলেছেন, আগামী দিনে দেশ থেকে দারিদ্রকে মুছেই ফেলা হবে। আর্থিক উন্নয়নের এমন জোয়ার আসবে যে সবরকম সামাজিক ব্যাধিই ভেসে যাবে। মোদিজি, আপনার 'শুনতে ভাল' এইসব বক্তৃতা আর আমাদের মনে কোনও দাগ কাটে না, কোনও আশা জাগায় না। কারণ আপনি বলেননি কী করে সমাজে ধনী এবং দরিদ্রের, মালিক এবং শ্রমিকের, পুঁজিপতি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদের ব্যাধি আপনি ঘোচাবেন। সব রকম সামাজিক ব্যাধির মূলে তো ধনীর দ্বারা গরিবের শোষণ। তা হলে শোষণ এবং বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই সমাজব্যবস্থাটি টিকিয়ে রেখে কোন জাদুমন্ত্রে আপনি এই বৈষম্য দূর করবেন? আসলে এসবই আপনার মন ভোলানো কথা, আপনিও আসলে আপনার পূর্বসূরিদের মতোই দেশের মানুষের সাথে প্রতারণা করছেন, মালিক শ্রেণির সুচতুর এজেন্ট হিসাবেই কাজ করছেন। আপনার কায়দাটা অন্যদের থেকে নতুন, কিন্তু আপনিও একই পথের পথিক। দারিদ্র মুছে ফেলার কথা আপনিই প্রথম বলছেন না, আপনার আর এক পূর্বসূরি ইন্দিরা গান্ধী 'গরিবি হঠাও' এর স্লোগান তুলেছিলেন। তা শুধু স্লোগানেই ছিল। যেমন আপনারই এক নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী সাইনিং ইন্ডিয়া তথা উজ্জ্বল ভারতের স্লোগান তুলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীজি, আমরা এখন এগুলো অনেকটাই ধরতে পারি, আপনাদের দ্বারা বারবার প্রতারিত হতে হতে আজ আমাদের চোখ খুলে গেছে। জেগে উঠছি আমরা।

কমরেড জে ভি স্ট্যালিনের ভাষণ

তিনের পাতার পর

যৌথখামার বহির্ভূত কৃষক আছে। তাদের সম্পর্কে কী করা হবে? এই সংশোধনের প্রস্তাবকরা কি তাদের হিসাব থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলছেন? তা করা ঠিক হবেনা। দ্বিতীয়ত, ঘটনা হল অধিকাংশ কৃষক যৌথখামারের সাথে যুক্ত হয়েছে মানে এ নয় যে তারা আর কৃষক নেই, তাদের কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই, তাদের নিজস্ব ঘরবাড়ি ইত্যাদি নেই। তৃতীয়ত, তখন "শ্রমিক" কথাটার বদলে আমাদের বসাতে হবে "সমাজতান্ত্রিক শিল্পের শ্রমজীবী জনগণ"। সংশোধনের প্রস্তাবকেরা যে কোনও কারণেই হোক এই প্রস্তাব রাখেননি।

সবশেষে, আমাদের দেশে কি শ্রমিক শ্রেণি আর কৃষক শ্রেণির অস্তিত্ব নেই? আর যদি তাদের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে চলতি বাগধারা থেকে তাদের নাম নিশ্চিহ্ন করা কি যুক্তিসংগত? পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে, সংশোধনীর রচয়িতাদের মনে বর্তমান সময়ের কথা নেই, আছে ভবিষ্যৎ সমাজের কথা— যে সমাজে শ্রেণি থাকবে না, যে সমাজে শ্রমিক-কৃষক রূপান্তরিত হয়ে সমসত্ত্ব সাম্যবাদী সমাজের শ্রমজীবী মানুষে পরিণত হবে। তাই, অবশ্যই তাঁরা সময়ের আগে দৌড়াচ্ছেন। কিন্তু সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে কেউ ভবিষ্যৎ থেকে শুরু করতে পারেন না। শুরু করতে হবে বর্তমান থেকে, যার অস্তিত্ব আছে তার থেকে। সংবিধান সময়ের আগে আগে দৌড়তে পারে না, দৌড়ান উচিতও নয়।

২. তারপর আসছে খসড়া সংবিধানের ১৭নং ধারা সংশোধনের প্রশ্ন। সংশোধনীতে প্রস্তাব করা হয়েছে সংবিধান থেকে ১৭নং ধারা পুরোপুরি তুলে দেওয়া হোক। গণ প্রজাতন্ত্রগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারবে — এই ধারায় সেই অধিকার সংরক্ষিত আছে। আমি মনে করি এই প্রস্তাব ভ্রান্ত এবং তাই কংগ্রেসের তা গ্রহণ করা উচিত নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন হল সম অধিকার সম্পন্ন গণপ্রজাতন্ত্রগুলোর স্বেচ্ছা মিলনের ফল।

যে ধারা তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার দিয়েছে সংবিধান থেকে সেই ধারা বাতিলের অর্থ হল সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বেচ্ছা মিলনের চরিত্রকে অগ্রাহ্য করা। এই পদক্ষেপের সাথে কি আমরা একমত হতে পারি? আমি মনে করি একমত হতে পারি না, একমত হওয়া উচিত নয়। বলা হয়, সোভিয়েত ইউনিয়নে একটা প্রজাতন্ত্রও নেই যা এ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। আর তাই ১৭নং ধারার কোনও বাস্তব গুরুত্ব নেই।

এটা অবশ্যই সত্য, কোনও প্রজাতন্ত্রই সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না।

কিন্তু কোনও মতেই তার অর্থ এ নয় যে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার আমরা সংবিধানে রাখব না। সোভিয়েত ইউনিয়নে এমন কোনও প্রজাতন্ত্র নেই যা অন্য প্রজাতন্ত্রকে পদানত করে রাখতে চায়। কিন্তু তার অর্থ কোনওমতেই এ হতে পারে না যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান থেকে আমরা সমঅধিকারের ধারাটা তুলে দেব।

৩. আর একটা প্রস্তাব হল খসড়া সংবিধানের ২নং অধ্যায়ে নতুন একটা ধারা যুক্ত করা দরকার। ধারাটা এই রকম— স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলো অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের যথাযথ স্তরে উন্নীত হওয়ার পর তাকে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত করতে হবে। এই প্রস্তাব কি গ্রহণ করা হবে? আমি মনে করি এই প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত নয়। এই প্রস্তাব ভ্রান্ত তার মর্মবস্তুর কারণে শুধু নয়, যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তার জন্যও বটে। স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রকে ইউনিয়ন রিপাবলিকে পরিণত করার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিপক্কতা কোনও ভিত্তি হতে পারে না। যেমন অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা কোনও প্রজাতন্ত্রকে স্বায়ত্বশাসিত প্রজাতন্ত্রের তালিকায় রেখে দেওয়ার ভিত্তি হতে পারে না। এ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নয়। যেমন তাতার রিপাবলিক স্বায়ত্বশাসিত প্রজাতন্ত্র, অন্য দিকে কাজাখ রিপাবলিক ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র। কিন্তু এ থেকে বোঝায় না যে অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক দিক থেকে কাজাখ প্রজাতন্ত্র তাতার প্রজাতন্ত্র থেকে উন্নত। বিষয়টা ঠিক উল্টো। যেমন একই কথা বলা যায় ভল্গা জার্মান অটোনমাস রিপাবলিক ও কিরঘিজ ইউনিয়ন রিপাবলিক সম্পর্কে। এর মধ্যে আগেরটা পরেরটার চেয়ে অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উন্নত, যদিও তা অটোনমাস রিপাবলিক হিসাবেই আছে।

(ক্রমশ)

সত্তর বছরের স্বাধীন দেশে
কৃষক-আত্মহত্যার সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে

সত্তর বছরের স্বাধীন দেশ। অধিকাংশ এমএলএ-এমপি কোটিপতি। তথাকথিত এই দেশসেবক নেতারা দিনরাত দেশের এমন সেবা করছেন যে, অন্যান্য হাজার একটা দুর্দশার মতো কৃষক-আত্মহত্যার সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়ছে। স্বাধীনতার পর থেকে এই সংখ্যাটার কোনও হিসাব আলাদা করে রাখা হত না। সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করার পর গণবিক্ষোভের চাপে ১৯৯৫ সাল থেকে তা শুরু করতে বাধ্য হয়েছে রাষ্ট্রের কর্তারা। হিসাবে বিস্তর কারচুপি ও দুর্নীতি ইত্যাদি করেও প্রতি বছর এই সংখ্যার লাগাতার বৃদ্ধি কমাতে পারেনি কোনও সরকার। তাদের দেওয়া হিসাবে ১৯৯৫ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত কৃষক-আত্মহত্যার সংখ্যা প্রায় তিন লাখ (২,৯৬,৪৩৮ জন)। অর্থাৎ গড়ে বার্ষিক প্রায় ১৭ হাজার। বাস্তবে এই সংখ্যাটা যে আরও বহুগুণ বেশি তা প্রায় সকলেই জানে। ২০১৪ থেকে ২০১৬-র জুন পর্যন্ত সরকারি হিসাবে শুধু মহারাষ্ট্রেই আত্মহত্যা করেছেন ৭,২৬২ জন কৃষক। গোটা দেশের সংখ্যাটা কতটা ভয়াবহ তা সহজেই অনুমেয়। 'দেশসেবক'দের দয়ায় এমনিতেই লাগাতার চরম দারিদ্র, অর্ধাহার, অনাহার, খরা-বন্যার প্রকোপ সহ্য করে প্রায় অনিশ্চিতভাবে কোনও রকমে টিকে থাকতেই দেশের সাধারণ মানুষ অভ্যস্ত। এমন মানুষও কতটা বিপন্ন এবং যন্ত্রণাবিদ্ধ হলে নিজেকে শেষ করে দিতে বাধ্য হন, সে কথা দেশের 'গণ্যমান্য'রা খোঁজ রাখার প্রয়োজনই মনে করেন না। অথচ এইসব বঞ্চিত লাঞ্ছিত শ্রমিক-কৃষকরা নিরুপায় হয়ে যখন আন্দোলনে নামেন, মিছিল-ধর্মঘট করেন তখন তা বানচাল করতে ওই 'মাননীয়'দের মায়াকান্নার অভাব হয় না।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই যুগে কৃষক ও কৃষিমজুর, যাঁরা আমাদের অন্ন জোগান, তাঁদের অধিকাংশের জীবনে নিয়ম করে দুর্দশা ঘনিয়ে থাকছে কেন? তাঁদের এই করুণ পরিণতি কোন উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য— সে উত্তর রাষ্ট্রকর্তারা দেন না। বরং গোটা ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে আর্ত কৃষকের হাতে নামমাত্র কিছু সরকারি 'ভিক্ষা' গুঁজে দেন, বিক্ষোভ প্রশমিত করতে ঋণ দেওয়ার টোপ দেন। পরিস্থিতির ফেরে বাধ্য হয়ে একাংশ কৃষক এই ফাঁদে পা দিয়ে আদতে আরও জেরবার হন। তাঁরা বুঝতেই পারেন না উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও অবশেষে কেন তাঁদের ভিক্ষার ফুটো বাটি হাতে দাঁড়াতে হয়, অথবা কীটনাশক খেয়ে মরতে হয়! এ হেন অবস্থায় রাষ্ট্র মানবিক হওয়ার পরিবর্তে আরও অমানবিক হয়ে উঠছে। ফসলের দাম না পেয়ে, চাষের বিপুল খরচ সামলাতে না পেরে অস্থির যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতেই যে কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন— এই সহজ কথাটা কোনও সরকারই স্বীকার করতে চাইছে না। তারা এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলিকে বিচ্ছিন্ন এবং ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসাবে দেখাতেই সবসময় কৌশলী প্রচার চালায়। কিন্তু অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে!

সুজলা-সুফলা ভারতবর্ষে প্রতি বছর কোটি কোটি মেট্রিক টন ধান-গম উৎপন্ন হয়। ডাল তেল চিনি ফল সব্জি দুধ মাছ মাংস ডিম উৎপন্ন হয়। অথচ দেশের একটা বিশাল সংখ্যক মানুষ অনাহার-অর্ধাহারে থাকতে বাধ্য হন। দক্ষিণ আফ্রিকার একটা দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের মানুষ যে মানের খাদ্যটুকু পায় আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের তাও জোটে না। কেন এই পরিস্থিতি? শুধু যে আমাদের দেশের অবস্থা এই তা নয়, গোটা বিশ্বেই এরকম অদ্ভুত বৈপরীত্য বিরাজ করছে। কারণ, রাষ্ট্রব্যবস্থাটা সেভাবেই তৈরি। মানুষের কী প্রয়োজন সে কথা বিচার করে এখানে উৎপাদন হয় না। কৃষক কী উৎপাদন করবে সে পরিস্থিতিও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তৈরি করে দেয় পুঁজিপতি-বৃহৎ ব্যবসায়ী। কৃষক নিজের ইচ্ছামতো চাষ করতে পারেন না। কারণ, উৎপন্ন ফসল তাঁরা জমিয়ে রাখতে পারেন না, সে সঙ্গতি তাঁদের নেই। সেই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে সস্তা দরে সে ফসল কিনে নিয়ে তার মালিক হয়ে যায় কতিপয় ধনকুবের ব্যবসায়ী। তাদের সিন্দুক আরও স্ফীত হয়, সর্বনাশ হয় চাষির।

সামাজিক সম্পদের উপর এই যে ব্যক্তিমালিকানার আধিপত্য, এই নির্মম শোষণমূলক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ভেঙে সামাজিক মালিকানা স্থাপন করার দ্বারাই একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শ্রমের ফসল পরাশ্রয়ী মালিকশ্রেণির আত্মসাৎ করা আটকানোর রাস্তা। কৃষকদের তাই বুঝতে হবে, সমস্যায় বিপর্যস্ত হয়ে জীবন শেষ করে দিলে সমস্যার সমাধান হবে না। বরং সমস্ত সম্পদের উপর সামাজিক মালিকানা স্থাপনের লড়াইকে জোরদার করতে হবে।

জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত খাজুরা লোকাল কমিটির মধুতটি গ্রামের প্রবীণ পার্টিকর্মী কমরেড চন্দ্রকান্ত বাউরী ১৭ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। কমরেড চন্দ্রকান্ত বাউরী '৬০-এর দশকে পুরুলিয়া জেলার প্রাক্তন সম্পাদক বর্তমান রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কেনারাম মণ্ডল এবং প্রয়াত প্রবীণ নেতা কমরেড ভাস্কর ভদ্রের মাধ্যমে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন।

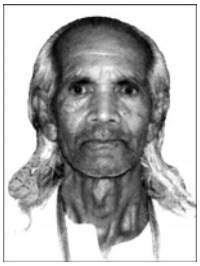

পরিবারের প্রবল আর্থিক সংকট এবং নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি দলের কাজ থেকে কখনও বিরত হননি। দলের মাসিক চাঁদা ও পার্টি কোটা মৃত্যুর মাস পর্যন্ত তিনি নিয়মিত দিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের দলের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা জীবনভর করে গেছেন। প্রথম হার্ট অ্যাটাকে প্রবল অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও গত বিধানসভা নির্বাচনে বুথ এজেন্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন এলাকার মানুষের আপনজন। নানা সমস্যায় তাঁদের পাশে দাঁড়াতেন এবং সমস্যা সমাধানে নানা আন্দোলন গড়ে তুলতেন।

তাঁর মৃত্যুতে দল একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, শৃঙ্খলাপরায়ণ কর্মীকে হারাল।

কমরেড চন্দ্রকান্ত বাউরী লাল সেলাম

'দেশপ্রেমিক' বিজেপি সরকার
দেশরক্ষার অস্ত্র কেনায় ঘুষের খেলা খেলছে

প্রধানমন্ত্রীর 'দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ ভারত' গড়ার ঠেলায় এবং নোট বাতিলের ধাক্কায় দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের প্রাণান্ত অবস্থা। এদিকে রাশিয়ার সাথে মোদি সরকারের সাম্প্রতিক অস্ত্র-চুক্তির পিছনে বিরাট অঙ্কের ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ উঠে এসেছে।

অক্টোবরের মাঝামাঝি গোয়ায় ব্রিকস সম্মেলনের সময় রাশিয়ার সাথে বিশাল মাপের প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছেন প্রধানমন্ত্রী। চুক্তিতে ৩৯ হাজার কোটি টাকার মিসাইল প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেনা, রাশিয়ার সাথে যৌথভাবে ২০০টি কামভ হেলিকপ্টার তৈরি করে রপ্তানি করা, ভারত-রাশিয়া যৌথভাবে যে 'ব্রহ্মস' মিসাইল তৈরি করে তার নতুন ছোট সংস্করণ তৈরি সহ আরও নানা কিছু আছে। অভিযোগ উঠেছে, এই চুক্তি স্বাক্ষরের পিছনে কাজ করেছে রাশিয়ান সমরাস্ত্র কারখানা কর্তৃপক্ষের বিপুল অঙ্কের ঘুষ। এ দেশের এক নামী অস্ত্র-দালালের মাধ্যমে রুশ অস্ত্র কোম্পানি ৭৩০ কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছে। সুধীর চৌধুরী নামের এই এজেন্ট ২০১৪ সালে ভারতীয় সেনার হেলিকপ্টার, ট্যাঙ্ক ইত্যাদির জন্য ব্রিটিশ সংস্থার তৈরি 'হক' ইঞ্জিন কেনার সময়ও ঘুষের কারবার করেছিল। দুর্নীতিমুক্ত ভারতের নমুনাই বটে!

যুদ্ধাস্ত্র এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনা-বেচায় ঘুষ দেওয়া-নেওয়া নতুন কথা নয়। স্বাধীন ভারতের বয়স যখন মাত্র এক বছর তখনই এই ধরনের কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়েছিল। ভি কে কৃষ্ণ মেননের নাম জিপ কেনা সংক্রান্ত দুর্নীতিতে জড়িয়ে যায়। যদিও মেনন সাহেব এত বড় কলঙ্কের দাগ নিয়েও জওহরলালের বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ আলো করেছিলেন। রাজীব গান্ধীর বোফর্স কামান দুর্নীতি, বারাক মিসাইল দুর্নীতি, কার্গিল যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের পরিবারের জন্য তৈরি মহারাষ্ট্রে আদর্শ আবাসনে ফ্ল্যাট বণ্টনে বিরাট ঘুষের কারবার— ইত্যাদি অংসখ্য কেলেঙ্কারি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র জুড়ে রয়েছে।

দুই দফায় কংগ্রেস শাসনের আগে বিজেপির অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে সরকার চলেছে। সেই সময়ে তাদের স্লোগান ছিল 'অন্য ধরনে'র সরকার গড়া। সেই 'অন্য ধরনের' সরকারেরও কেলেংকারির শেষ ছিল না। স্বয়ং বিজেপি সভাপতি বঙ্গারু লক্ষ্মণকে তহলকা স্টিং অপারেশনে ঘুষ নিতে দেখা গেছে। কার্গিল যুদ্ধের সময় বিজেপি সরকার দেশের মানুষকে দেশপ্রেমের ন্যায় ভাসিয়ে মৃত সৈনিকদের কফিন কেনায় ঘুষ দেওয়া নেওয়া করতে দ্বিধা করেনি। দেশ চালানোর দীর্ঘ ইতিহাসে দল বদল, নেতা বদল হয়েছে। ঘুষ দেওয়া নেওয়ার ঐতিহ্যের বদল হয়নি।

এসবের বিরুদ্ধে জোরদার আওয়াজ তুলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ঘৃণাকে পুঁজি করে মসনদে বসলেন নরেন্দ্র মোদি, 'স্বচ্ছ ভারত'-এর স্লোগান তুললেন। ঝাঁটা নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লেন। কিন্তু তাঁর সরকারের দুর্নীতির কালো ধুলো কি দূর হল? 'স্বচ্ছ ভারত'-এর মোদি জমানা আগেকার দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারগুলির থেকে যে কিছুমাত্র আলাদা নয়, এই অস্ত্র চুক্তির পিছনে ঘুষের কারবার সে কথাই প্রমাণ করল।

দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের দরজায় দরজায় ঘুরে মোদিজি যেটুকু লগ্নির প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন তা এই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেই। প্রতিরক্ষা শিল্প ছাড়া পুঁজি লগ্নি করার কোনও জায়গা পুঁজিপতিদের আজ আর নেই। যুদ্ধের জিগির তুলে অস্ত্র তৈরি এবং তা বিক্রির ব্যবসাই একমাত্র ভাল চলছে। কারণ এখানে সরকার নিজেই ক্রেতা। বাকি সমস্ত ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বাজারসংকট। তাই মরতে বসা গোটা পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে প্রতিরক্ষামুখী করে তোলা হচ্ছে। চলছে অর্থনীতির সামরিকীকরণ। প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশের মতো আমাদের দেশের সেনাবাহিনীর পিছনে বাজেটের সিংহভাগ খরচ করা হয়। প্রতি বছর এই খাতে খরচের বহর বাড়ে। অস্ত্র ব্যবসা চালানোর জন্য যুদ্ধের জিগির মন্ত্রী এবং শাসক বিজেপি নেতাদের মুখে মুখে। সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ, চীন, পাকিস্তানের জুজু দেখানোর

আটের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

বর্ধমান জেলার লাউদোহা আঞ্চলিক কমিটির তিলাবনী গ্রামের পার্টি সদস্য কমরেড বলরাম বাউরী ৭৩ বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ২৮ নভেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৬৬-'৬৭ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রয়াত কমরেড বিশ্বপ্রকাশ গোস্বামী যখন লাউদোহা অঞ্চলে দলের সংগঠন এবং ভাগচাষি বর্গাদারদের নানা দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলছিলেন, সেই সময় কমরেড বলরাম বাউরী সক্রিয় ভাবে যুক্ত হন। যতদিন চলাফেরা করতে পেরেছেন দলের সমস্ত কর্মসূচিতে শুধু নিজে অংশগ্রহণ করতেন তাই নয়, এলাকার মানুষকে তাতে যুক্ত করার জন্য সবদিক থেকে চেষ্টা করতেন। শিশু-কিশোরদের অবক্ষয়িত সংস্কৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের মধ্যে মনীষী চর্চা, উন্নত মূল্যবোধ ও স্বাস্থ্য চর্চা করার জন্য কমরেড সাধারণ সম্পাদকের আহ্বান তাঁর কাছে পৌঁছানো মাত্রই তিনি অন্য কর্মীর সহযোগিতা নিয়ে তা শুরু করেছিলেন।

৩ ডিসেম্বর তাঁর স্মরণসভায় রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী তাঁর চরিত্র ও সংগ্রামের বিভিন্ন অনুকরণীয় দিকগুলি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। সভার শুরুতে সভাপতি কমরেড আব্দুল জলিল, অন্যান্য বক্তা ও নেতা-কর্মীরা তাঁর প্রতিকৃতিতে ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড বলরাম বাউরী লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

ঝাড়খণ্ডে জনজীবনের সমস্যা প্রতিকারের দাবিতে রাজভবনের সামনে ধরনা

জল-জঙ্গল-জমি বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মুনাফার পায়ে বলি দেওয়ার সরকারি ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে এবং নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, শ্রমিকদের ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা মজুরি, চাষিদের ফসলের ক্ষতিপূরণ, বেকারদের চাকরি ইত্যাদি দাবিতে ১২ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা বিপুল সংখ্যক মানুষ রাঁচিতে রাজভবনের সামনে ধরনায় বসেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড রবীন সমাজপতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অল ইন্ডিয়া এম এস এস-এর কলকাতা জেলা সম্মেলন

নারী নির্যাতন, শিশু ও নারীপাচার, মদের ঢালাও লাইসেন্স, নোট বাতিল, অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রভৃতির বিরুদ্ধে এবং পাচারকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল প্রথা চালুর দাবিতে ১১ ডিসেম্বর এ আই এম এস এস-এর কলকাতা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে।

বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড হাসি হোড় এবং সম্পাদক কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী। কমরেড মীনাক্ষী কর্মকারকে সভাপতি ও কমরেড রুনা পুরকাইতকে সম্পাদক করে ৬৯ জনের কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনে প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

ধন্য বিজেপি সরকারের উন্নয়ন
ভারত দারিদ্রে প্রথম, ধনীদের সম্পদে দ্বিতীয়

শিক্ষা কিংবা জনস্বাস্থ্যে ভারত বিশ্বে পিছনের তালিকায় থাকলেও একটি বিষয়ে প্রথম স্থানে! যদিও তাতে গর্বের কিছু নেই, বরং ভারতবাসীর কাছে তা লজ্জারই। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গরিব মানুষের বাস ভারতে! গ্লোবাল ওয়েলথ রিপোর্ট ২০১৬-তে এই লজ্জাকর চিত্র উঠে এসেছে।

এটাই ভারতের একমাত্র চিত্র নয়। ৯৯ শতাংশ ভারতের এই দুর্দশা হলেও ১ শতাংশের সম্পদশালী ভারত ধনবৈষম্যের দিক থেকে বিশ্বে দ্বিতীয়। মাত্র এক শতাংশ ভারতীয়ের হাতে আছে দেশের ৬০ ভাগ সম্পদ। ২০১৬ সালের তালিকা অনুযায়ী, ভারতে প্রথম ২০ জন সম্পদশালীর ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ ২২.৭ বিলিয়ন থেকে শুরু করে ৫.১ বিলিয়নের বেশি। অর্থাৎ ২ হাজার ২৭০ কোটি থেকে শুরু করে ৫ শত ১০ কোটি পর্যন্ত। এই তালিকার শীর্ষে রয়েছেন বিজেপি ঘনিষ্ঠ মুকেশ আম্বানি। তালিকায় আছে হিন্দুজা, প্রেমজি, মিত্তল, সাংভি, বিড়লা, আদানি, রুইয়া, জিন্দাল সহ আরও কত রাঘববোয়াল। ফোর্বস ম্যাগাজিনের ২০১৬-র সমীক্ষা বলছে, বিশ্বের ১০০ জন ধনীশ্রেষ্ঠের তালিকায় প্রথম ৫০ জনের মধ্যেই রয়েছেন ৩ ভারতীয় ধনকুবের।

কোন ভারত ধনকুবেরদের তালিকায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সম্পদশালীর দেশ আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে? যে ভারতের ১৩০ কোটি মানুষের বেশিরভাগই দিনে একবার ভরপেট খেতে পায় না, যে দেশের ৬২ শতাংশ মানুষ বেকার, ৭৭ শতাংশ পরিবারে নিয়মিত রোজগেরে ব্যক্তি নেই, শিক্ষায় পিছনের সারিতে, শিশুপাচার-নারীপাচারে প্রথম সারিতে, শিশুশ্রমিকের সংখ্যায় ভারাক্রান্ত, যে ভারতে প্রতি বছর দেশের প্রায় চার কোটি মানুষ চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছেন, সেই ভারত। পরিকল্পনা কমিশনের তথ্য বলেছে, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া গ্রামীণ ৪৭ শতাংশ ও শহরের ৩১ শতাংশ মানুষের— অর্থাৎ হাসপাতালে ভর্তির শতকরা মোট ৭৮ জনই চিকিৎসার খরচ চালাতে বিপুল ঋণ করছেন কিংবা সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন, উদারিকরণের হাত ধরে এই হল ভারতের উন্নয়নের প্রকৃত চিত্র। এই বৈষম্য আসলে শ্রেণি বৈষম্য। ১ শতাংশ এই পুঁজিপতিদের জন্যই নরেন্দ্র মোদির ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়ার স্লোগান। আর ৯৯ শতাংশের ভারত? তাদের জন্য শুধুই বুক ভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস আর হাহাকারের শূন্যতা।

পাচারের প্রতিবাদে জেলায় জেলায় সোচ্চার শিশু-কিশোররাও

কলকাতার হাজরা মোড়

রাজধানী কলকাতা শহর সহ বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা শিশু পাচার চক্রের মাধ্যমে মোটা টাকার বিনিময়ে সদ্যোজাত শিশুদের বিক্রির জন্য পাচার করার ভয়াবহ ঘটনার যতটুকু সামনে এসেছে তাতেই শিউরে উঠেছে রাজ্যবাসী। শিশু পাচারের এই অমানবিক, ঘৃণ্য ঘটনার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)-র কিশোর সংগঠন কমসোমল রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ, অবস্থান ও নানা ধরনের কর্মসূচিতে সামিল হয়েছে।

মেদিনীপুর শহর

২৯ নভেম্বর কোচবিহারে শতাধিক শিশু-কিশোর শহরের পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে।

২ ডিসেম্বর পুরুলিয়ার আনাড়ায় শিশু-কিশোররা মিছিলে দাবি তুলেছে পাচারকারী কঠোর শাস্তি দেওয়ার। ১২ ডিসেম্বর কলকাতার হাজরায় কমসোমল সংগঠনের উদ্যোগে শতাধিক শিশু-কিশোর ছবি আঁকা, পোস্টার লেখার মধ্য দিয়ে এই ঘৃণ্য ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানায়।

নদীয়ার কৃষ্ণনগরে দেড় শতাধিক কিশোর-কিশোরী ১৩ ডিসেম্বর এক প্রতিবাদ সভায় তাদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে প্রায় সাড়ে তিনশ' কিশোর-কিশোরী জেলার নানা প্রান্ত থেকে সমবেত হয়েছিল এ ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানাতে। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে, হুগলির শ্রীরামপুরেও কিশোর সংগঠন কমসোমল প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছে।

৩ ডিসেম্বর মেদিনীপুর স্টেশন থেকে প্রায় একশো শিশু-কিশোরের সুসজ্জিত মিছিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখায় এবং স্মারকলিপি পেশ করে।

এ আই এম এস এস-এর বিক্ষোভ

এ আই এম এস এসের হাওড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে ৯ ডিসেম্বর 'হাওড়া ময়দান কোর্ট চত্বরে শিশু পাচারের প্রতিবাদে একটি জাঠা ও বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেড পুতুল চৌধুরী ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মিতা হোড়।

অস্ত্র কেনায় ঘুষ

সাতের পাতার পর

সাথে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন না হোক, অন্তত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর রাষ্ট্র হতে মরিয়া ভারত তার অস্ত্র ভাণ্ডার ক্রমাগত বাড়িয়েই চলেছে। করভারে ন্যুব্জ জনগণের রাজস্বের টাকায় এই অস্ত্র কেনা চলছে। আর তা কিনতে হাজার হাজার কোটি টাকার কাটমানি ঢুকছে ক্ষমতাসীন দলগুলোর নেতা, মন্ত্রী, সরকারি আমলা, দালাল চক্রের পকেটে।

ঘুষের টাকা পকেটে পুরতে পুরতেই সেনাবাহিনীকে দেবতার আসনে বসিয়ে দেশপ্রেমের হাওয়া তুলছেন বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা। এই দেশপ্রেমকে চাগিয়ে তোলা হচ্ছে হিন্দু জাতীয়তাবাদের মোড়কে। জঙ্গি হানায় মৃত সৈনিককে নিয়ে যে ধরনের প্রচার চালানো হচ্ছে তার পিছনে আসলে আছে ভোটের হিসাব নিকাশ। সেনা-পুজো নিয়ে প্রশ্ন তুললেই দেশদ্রোহীর তকমা আঁটতে লাঠি হাতে তৈরি সংঘসেবকরা। এরা যদি সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হত, তাহলে কাটমানি নিয়ে অস্ত্র কিনত কি? ঘুষ দিয়ে পকেট ভরানোর রাস্তা খোলা রেখে যে অস্ত্র তাঁরা দেশরক্ষার নামে কিনছেন, তার মান নিয়ে প্রশ্ন তো উঠবেই! বাজপেয়ীজির আমলে একের পর এক মিগ বিমান ভেঙে পড়ার ইতিহাস মানুষ ভুলে যায়নি। বহু সেনার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল সেই সব দুর্ঘটনা। তার পিছনেও যে দুর্নীতির খেলা ছিল, তা আজ আর গোপন নেই।

মুমূর্ষু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা দুর্নীতি রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার থাবা বসিয়েছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রও স্বাভাবিক ভাবেই ব্যতিক্রম নয়। বলাই বাহুল্য, এই ক্ষেত্রের আঁটোসাঁটো গোপনীয়তা ভেদ করে দুর্নীতির যতটুকু ঘটনা ফাঁস হচ্ছে, তা হিমশৈলের চূড়া মাত্র।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org